# ধূমগড়ের পিশাচ রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
(ছোটগল্প)

**ধূমগড়ের পিশাচ রহস্য|** প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হাতে নস্যির কৌটো। হঠাৎ বলে উঠলেন, –অ্যাঃ! পিচাশ!

হাসি চেপে বললাম, –কথাটা পিশাচ হালদারমশাই!

উত্তেজিত হলেই ঢ্যাঙা গড়নের এই গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও ঢ্যাঙা হয়ে ওঠেন যেন। গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপে। বললেন, –মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে সার্ভিস করছি। অন্ধকারে বনবাদাড়ে শ্মশানেমশানে ঘুরছি। কখনও পিচাশ দেখি নাই। কর্নেলস্যার, দেখছেন নাকি?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা গাবদা পুরোনো বই পড়ছিলেন। দাঁতের ফাঁকে আটকানো চুরুটের নীল ধোঁয়া তার চকচকে টাকের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে খেলা করছিল। ঋষিসুলভ সাদা দাড়িতে একটুকরো চুরুটের ছাই আটকে ছিল। মুখ তুলতেই তা খসে পড়ল। বললেন, -কী হালদারমশাই?

-পিচাশ!

–নাহ। দেখিনি। তবে শুনেছি পিশাচ নাকি শ্মশানের আশেপাশে থাকে। মড়া খায়।

ধূমগড়ের পিচাশ ব্যাবাক একটা মড়া খাইয়া ফ্যালাইছে। –হালদারমশাই আবার একটিপ নস্যি নিলেন। উত্তেজনার সময় দেশোয়ালি ভাষায় কথা বলাও ওঁর অভ্যাস। বললেন : জয়ন্তবাবুগো পেপার না লিখলে কথা ছিল। ছয় লক্ষ সার্কুলেশন। তাই না জয়ন্তবাবু?

বললাম, -আজ রোববারে ছ লাখ। অন্যদিন চার লাখ। কিন্তু দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার ওই খবরটা মোটেও এক্সক্লুসিভ নয়। নিউজ এজেন্সির পাঠানো খবর। কাজেই এ খবরকে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। আসলে পাতা ভরানোর জন্য অনেক সময় বাজে খবরও ঢোকাতে হয়। আবার সাংবাদিকরাও মাঝে মাঝে রাজনীতির কচকচি থেকে পাঠকদের রিলিফ দিতে মজার-মজার খবর তৈরি করেন। বিশেষ করে আজ রোববার ছুটির দিন পাঠকদের একটু আনন্দ দেওয়া মন্দ কী?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন- জয়ন্তের কথায় কান দেবেন না হালদারমশাই! ধূমগড়ের শ্মশানে সত্যিই পিশাচের ডেরা আছে। পিশাচটা একটা মড়ার পেট চিরে নাড়িভুড়িও খেয়েছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যথারীতি যাই গিয়া বলে জোরে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম, –সর্বনাশ! হালদারমশাই সত্যিই ধূমগড়ে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল বললেন, -গেলে একটা রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। তুমিও ওঁর সঙ্গ ধরলে পারতে।

–কী আশ্চর্য! আপনি এই গাঁজাখুরি খবরে বিশ্বাস করেন?

–করি বইকী। বিশ্বপ্রকৃতিতে রহস্যের কোনো শেষ নেই ডার্লিং!

–কর্নেল! আপনি কী বলছেন? পিশাচ-টিশাচ মানুষের আদিম বিশ্বাস। কুসংস্কার মাত্র।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু একটু হেসে বললেন, তুমি ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! ক্রোম্যাগনন মানুষ এবং হোমো স্যাপিয়েন-স্যাপিয়েন অর্থাৎ আধুনিক মানুষের মধ্যেকার পর্যায়ে অবস্থা কী ছিল, এখনও বিশেষ জানা যায়নি। তাই মিসিং লিংক কথাটা বলা হয়। কে বলতে পারে পিশাচ সেই মিসিং লিংক নয়? বিশেষ করে ধূমগড় জায়গাটা আমি দেখেছি। পাহাড় জঙ্গল নদী আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহস্যময় অনেক কিছুই থাকতে পারে। ওখানকার শ্মশানটাও ঐতিহাসিক।

কর্নেল বইটা টেবিলে রাখলেন। এতক্ষণে চোখে পড়ল, মলাটে সোনালি হরফে লেখা আছে : ধূমগড়ের রাজকাহিনি। বললাম, –তা হলে বোঝা যাচ্ছে, পিশাচের গল্প এই বইটাতেও আছে।

কর্নেল হাসলেন, -নাহ। এটা ধুমগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কাহিনি। ১৮৯০ সালে রাজাবাহাদুর জন্মেজয় সিংহের লেখা পারিবারিক ইতিহাস।

ব্যাপারটা সন্দেহজনক কিন্তু।

–কেন?

কাগজে ধূমগড়ে পিশাচের খবর বেরুল, আর বইটাও আপনার হাতে চলে এল।

ষষ্ঠীচরণ আরেক দফা কফি আনল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, -বইটা আমার হাতে উড়ে আসেনি। গত মাসে ধূমগড় গিয়েছিলাম অর্কিডের খোঁজে। ওই সময় ওখানকার রাজাদের বংশধর রণজয় সিংহের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথায়-কথায় বংশের লম্বাচওড়া গল্প শোনালেন। গল্পগুলো যে সত্যি, তা প্রমাণের জন্য এই বইটা আমাকে পড়তে দিলেন। আমি উঠেছিলাম নদীর ধারে ফরেস্ট-বাংলোয়। সেখানে বিদ্যুৎ নেই। হ্যারিকেনের আলোয় বইটা পড়তে শুরু করলাম। সকালে ফেরত দেবার কথা ছিল। হঠাৎ রণজয় সিংহ রাতদুপুরে গিয়ে হাজির। ভেবেছিলাম পারিবারিক ইতিহাসের বইটা নিয়ে কেটে পড়েছি কিনা দেখতে এসেছেন। কিন্তু তা নয়। ভদ্রলোক চুপিচুপি একটা অদ্ভুত কথা বললেন। বইয়ের ভেতর একটা ধাঁধা আছে।

ওটার জট ছাড়াতে পারলে আমাকে সাধ্যমতো পুরস্কৃত করবেন। ধাঁধাটা হল :

পাষণ্ডের পা

কভু ধরিস না

মস্তকে ঘা

কী জ্বলে রে বাবা।

কর্নেল কফিতে আবার চুমুক দিলেন। বললাম, -সেকেলে লোকেরা শুনেছি কথায়-কথায় ধাঁধা আওড়াতেন। কিন্তু এ ধাঁধাটা একেবারে গোলকধাঁধা।

আমি হেসে উঠলাম। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, -কী বললে? কী বললে? গোলকধাঁধা?

–হ্যাঁ। গোলকধাঁধাই বলা চলে।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর টেলিফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল করে সাড়া পেয়ে বললেন, -সঞ্জয়বাবু! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। আপনার জ্যাঠামশাই, ... চলে গেছেন? ... ঠিক আছে। রাখছি।

টেলিফোন রেখে উজ্জ্বল হেসে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। বললেন, –ব্রিলিয়ান্ট, ডার্লিং ব্রিলিয়ান্ট! এ বেলা আমার ঘরে তোমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন।

অবাক হয়ে বললাম ব্যাপার কী? হঠাৎ আমার এত প্রশংসার কী হল?

একটি জটিল রহস্যের সমাধান তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। –বৃদ্ধ রহস্যভেদী বাকি কফিটুকু শেষ করে চুরুট ধরালেন। বললেন : আসলে অনেকসময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। অবশ্য তফাত শুধু একটা ও-কারের। ও-কার জুড়লেই তো সব জল হয়ে গেল।

আরও অবাক হয়ে বললাম, -কী অদ্ভুত!

অদ্ভুত তো বটেই। -কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন : তবে এবার পিশাচটাকে খুঁজে বের করা দরকার। সেজন্যই ধূমগড়ে ছুটতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে জয়ন্ত, হালদারমশাই পিশাচটার পাল্লায়

পড়লে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে পারবেন না। কথাটা যদি দৈবাৎ কিছুক্ষণ আগে তোমার মুখ দিয়ে বেরুত!....

**ও-কার রহস্য|** রাত এগারোটা নাগাদ ট্রেন থেকে নেমে দেখি ছোট্ট স্টেশন। নিরিবিলি সুনসান চারদিক। আমি ভেবেছিলাম ধূমগড় নাম এবং রাজারাজড়ার রাজধানী ছিল যখন, তখন স্টেশনটা বেশ বড়োসড়োই হবে। কর্নেল আমার মনের খবর কী করে টের পেয়ে বললেন, –আমরা ওল্ড ধূমগড়ে নেমেছি। নিউ ধূমগড় পরের স্টেশন। দূরত্ব তিন কিলোমিটার। ওটা বড়ো স্টেশন।

বললাম, তা হলে এখানে নামলেন কেন?

আমাদের টিকিট ওল্ড ধূমগড় অব্দি।

–কিন্তু এখানে তো লোকজন দোকানপাট দেখছি না। যানবাহনও চোখে পড়ছে না।

সেটাই তো সুবিধে। –বলে কর্নেল পা বাড়ালেন!

গেটে টিকিট নেওয়ারও লোক নেই। স্টেশনঘরের ভেতর স্টেশনমাস্টার একলা বসে টরে টক্কা করছেন। উর্দিপরা এক রেলকর্মী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সম্ভবত আকাশের তারা গুনছিল। সে আমাদের কথা শুনতে পেয়ে হনহন করে এগিয়ে এল। ভেবেছিলাম টিকিট চাইবে। কিন্তু সে টিকিট চাইল না। চাপা স্বরে বলল, – এত্তা রাতমে আপলোগ টিশনকে বাহার মাত্ যাইয়ে সাব। খতরনাক হো যায়ে গা।

কর্নেল বললেন, -হাম শুনা ইধার এক পিশাচ নিকলা। সাচ?

-সাচ বাত সাব! দেখিয়ে না, ইয়ে টিসনমে কোই প্যাসিঞ্জার নেহি উতরা। সব আগলে টিসনমে উতরেগা।

-হামলোগ পিশাচ পাকাড়নে আয়া।

–তামাশা মাত কিজিয়ে সাব। মেরা বাত শুনিয়ে।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, -গভমেন্ট হামকো পিশাচ পাকড়নেকে লিয়ে ভেজা। ইয়ে দেখো, ক্যায়সে হাম উনকো পাকড়ায়েগা!

কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক বের করে কর্নেল বেতাম টিপলেন। স্টিকের ডগায় সূক্ষ্ম সবুজ রঙের জাল ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ল। রেলকর্মী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেল জাল গুটিয়ে স্টিক কিটব্যাগে গুঁজে গেট দিয়ে বেরুলেন।

স্টেশনের পেছনে একটা খাঁ-খাঁ চত্বর। তার ওধারে সংকীর্ণ একটা পিচের রাস্তা অব্দি আলো পৌঁছেছে। তারপর গাঢ় অন্ধকার। কর্নেল টর্চ ফেলে বললেন, -তোমার টর্চও রেডি রেখো।

ততক্ষণে আমি টর্চ বের করেছি। বললাম, –কিন্তু এভাবে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

-বনবাংলোয়।

–সেটা কতদূরে?

কাছেই।

অস্বস্তি হচ্ছিল। টর্চের আলোয় দুধারে ঘন জঙ্গল আর বড়ো-বড়ো পাথরের চাই দেখা যাচ্ছিল। কিছুদূর উতরাইয়ের পর চড়াই শুরু হল। বারবার পিছনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছিলাম। কলকাতার কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে যে পিশাচের অস্তিত্ব অবাস্তব মনে হয়েছিল, এখানে এখন তা একেবারে বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। কর্নেল বললেন, -টর্চের ব্যাটারি খরচ কোরো না জয়ন্ত! আমার ধারণা, পিশাচ শ্মশানের কাছাকাছিই আছে। শ্মশান এখান থেকে দুরে।

একখানে পিচরাস্তাটা ছেড়ে খোয়াঢাকা একফালি পথ ধরলেন কর্নেল। পথটা চড়াইয়ে উঠেছে। ওপরে খানিকটা দূরে আলো জুগজুগ করছিল। এবার দেখলাম, আমরা একটা টিলার ঢাল বেয়ে উঠছি।

একটু পরে সেই আলোটার দিক থেকে কেউ বলে উঠল, -কৌন বা?

কর্নেল গলা চড়িয়ে বললেন, -চতুর্মুখ নাকি?

জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর দৌড়ে এল একজন খাঁকি প্যান্টশার্ট পরা লোক। তার একহাতে বন্দুক। বুঝলাম ফরেস্ট গার্ড। সে স্যালুট ঠুকে বলল, –কর্নিলসাব! আপ?

– হ্যাঁ চতুর্মুখ। দয়ারাম আছে তো? নাকি পিশাচের ভয়ে বাড়ি পালিয়েছে?

চতুর্মুখ হাসল, –জি, হাঁ কর্নিলসাব। তবে আপনার কিছু অসুবিধা হবে না। আমি আছি। মানিকলালভি আছে।

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম। চতুর্মুখ লোকটি সাহসী বোঝা গেল। তার মতে, পিশাচের সত্যিমিথ্যা সে জানে না। তবে এমনও হতে পারে, গুজব রটিয়ে চোরা শিকারি বা কাঠ পাচারকারীরা এই মওকায় জঙ্গল লুঠবে! তাই রেঞ্জারসায়েব তাদের দুজনকে রাত জেগে নজর রাখতে বলেছেন। উঁচু কাঠের টাওয়ারের দিকে ঘুরে চতুর্মুখ চেঁচিয়ে বলল, -মানিকলাল! কলকত্তাসে কর্নিলসাব আয়া!

সেখান থেকে সাড়া এল, -সেলাম কর্নিলসাব!

বাংলোটা কাঠের তৈরি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, বেশ ছিমছাম সাজানো-গোছানো। জানালাগুলো খুলে দিলে হাওয়া খেলতে লাগল। পেছনে নদীর জলের কলকল ছলছল শব্দ। খাওয়া আমরা ট্রেনেই সেরে নিয়েছিলাম। কর্নেল তার প্রিয় পানীয় কফি চিনি, টিনের দুধ এবং কিছু স্ন্যাক্স এনেছেন সঙ্গে। চতুর্মুখ ঝটপট কিচেনে কেরোসিন কুকার জ্বেলে কফি করে আনল।

পিশাচের গল্পটা চতুর্মুখ সবিস্তারে শোনাল এবং আগেই বলে দিল, সবই তার শোনা কথা। দিন চারেক আগে রাজবাড়ির একজন বয়স্ক চাকর হঠাৎ ধড়ফড় করতে করতে মারা পড়ে। তখন রাত প্রায় নটা-দশটা। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, হার্টফেল। রাজবাড়ি এখন নামেই। অবস্থা পড়ে এসেছে। দালানকোঠা দিনেদিনে মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়েছে। তো লোকটাকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেছে, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সব কাঠ ভিজে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। তাই দুজনকে বসিয়ে রেখে বাকি লোকেরা শুকনো কাঠ আনতে গিয়েছিল। তখন বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু বিজলি চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। হঠাৎ লোকদুটো নাকি বিজলির ছটায় দেখে, কালো কী একটা জন্তু দুই পায়ে হেঁটে মড়ার খাটিয়ার কাছে এল। মুখের দু-পাশে দুটো বড়োবড়ো দাঁত।

বীভৎস মুখ। লোকদুটো পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে লাঠিসোঁটা বন্দুক বল্লম টর্চ নিয়ে অনেক লোক শ্মশানে ছুটে আসে। দেখে, খাটিয়ার মড়া নেই। খুঁজতে খুঁজতে একটু তফাতে জঙ্গলের ভেতর মড়া পাওয়া যায়। কিন্তু পেটের নাড়িভুড়ি সবটাই খুবলে তুলে সেই দুপেয়ে জন্তুটা খেয়ে ফেলেছে। এবার সবাই ধরে নেয়, জন্তুটা পিশাচ। মড়াটা অবশ্য দাহ করা হয়।

পরদিন রাতে রাজবাড়ির বড়োতরফ রণজয় সিংহের কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। জানলার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। টর্চের আলো জ্বালতেই নাকি পিশাচটাকে দেখতে পান। ভিতু মানুষ। হাত থেকে টর্চ পড়ে যায়। পরে চ্যাঁচামেচি করেন। ততক্ষণে পিশাচ উধাও। গুজব এত বেশি রটেছে যে, ধূমগড়ের অনেকেই নাকি পিশাচটা দেখেছে। তাই সন্ধ্যার পর বাজার দোকানপাট রাস্তাঘাট সুনসান ফাঁকা হয়ে যায়। কেউ নাকি সন্ধ্যার পর পারতপক্ষে একা বেরোয় না।

ঘটনাটা শুনিয়ে চতুর্মুখ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। তবে সে বলে গেল, পিশাচ না আসুক, নদী পেরিয়ে জঙ্গল থেকে বাঘ-ভালুক আসতেও পারে। কাজেই আমরা যেন দরজা ভালো করে এঁটে শুই।

খবরের কাগজে মোটামুটি ওইরকম বিবরণই বেরিয়েছে। তবে রণজয়বাবুর জানলায় পিশাচের আবির্ভাবের কথা বেরোয়নি। সন্ধ্যার পর সব নিরিবিলি হওয়ার কথাও বেরোয়নি।

কর্নেল দরজা এঁটে জানলা ধারে বসে চুরুট ধরালেন। বললেন, -শুয়ে পড়ো জয়ন্ত!

-আপনি কি পিশাচের জন্য রাত জাগবেন নাকি?

–নাহ। ধূমগড়ের রাজকাহিনির শেষ কয়েকটা পাতা পড়ে নিয়ে ঘুমোব।

–আর পড়ে কী লাভ? আপনি তো বলছিলেন, একটা জটিল রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন, -তোমারই সাহায্যে হয়ে গেছে।

-গোলকধাঁধা শুনে?

–একটা ওকার জুড়েই সব জল হয়ে গেছে।

–প্লিজ কর্নেল! হেঁয়ালি করবেন না। ও-কারের চোটে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

–গোলকধাঁধার গোলকের একটা ও-কার দরকার ছিল। অর্থাৎ গোলোক। রাজবাড়ির যে বয়স্ক চাকর হঠাৎ ধড়ফড় করে মারা গেছে, তার নাম ছিল গোলোক।

-বুঝলুম। গোলোক থেকে কী করে রহস্য ফাস হল?

রাতবিরেতে হঠাৎ ধড়ফড় করতে করতে মরে গিয়ে গোলোকই রহস্য ফাঁস করেছে।

–তার মানে?

–ওই শোনো! ফেউ ডাকছে। কাছাকাছি কোথাও বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে চুপ করলাম। সত্যিই ফেউ ডাকছে। ...

**ধাঁধার জট ছাড়ল|** কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমার ঘুম ভাঙালেন। বললেন, -দয়ারামকে সাহস দিয়ে নিয়ে এলাম। চতুর্মুখ আর মানিকাল রাত জেগে ডিউটি করে। ওদের ঘুমোনো দরকার।

দয়ারাম বাংলোয় চৌকিদার। সেও খুব ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে পিশাচকাহিনি শোনাল। সে জনৈক ফোটোগ্রাফার রামবাবুর কথা বলল। রামবাবু নাকি পিশাচটার ফোটো তুলেছেন। রাতে ওঁর জানালায় পিশাচটা গিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। উপস্থিত বুদ্ধি খাঁটিয়ে রামবাবু ক্যামেরায় ফ্ল্যাশবালবের সাহায্যে ছবি তোলেন।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেলের সঙ্গে বেরোলাম। প্রায় এক কিলোমিটার যাওয়ার পর বসতি এলাকা চোখে পড়ল। বাঁ-দিকে নদী। নদীর ধারে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। টিলার গায়ে

একটা কেল্লাও দেখতে পেলাম। কেল্লা আর আস্ত নেই। কেল্লার নীচে দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর বিশাল প্রাচীন একটা শিবমন্দির দেখলাম। মন্দিরের ওপাশে ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটাই রাজবাড়ি।

গেট ধসে পড়েছে। দুধারে পামগাছের সারি পুরোনো আভিজাত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখতে পেয়ে রোগা এবং পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে গায়ের রং এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। রাজবংশের বড়োতরফ রণজয় সিংহ।

রণজয়বাবু বললেন, -আপনি দুদিন পরে আসবেন বললেন। তাই চলে এলাম কলকাতা থেকে।

কর্নেল বললেন, -হঠাই চলে এলাম। আমার এই তরুণ সাংবাদিক বন্ধু রাজাবাহাদুর জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়াতে সাহায্য করেছে।

রণজয়বাবুর মুখে বিস্ময় এবং আনন্দ ফুটে উঠল, –কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, খুঁজে পাচ্ছি না কর্নেলসায়েব! চলুন, ঘরে গিয়ে বসা যাক।

-পরে বসা যাবে। প্রথমে আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

–বলুন!

বৃহস্পতিবার রাতে গোলোক কি মন্দির চত্বরে মারা গিয়েছিল?

–হ্যাঁ। মন্দির চত্বরে।

–আপনার চোখের সামনেই তো ধড়ফড় করতে করতে মারা গিয়েছিল?

-হ্যাঁ। আমি ওকে ভোরে কলকাতায় আমার ভাইপো সঞ্জয়ের কাছে পাঠাব ভেবেছিলাম। তাই ওকে খুঁজছিলাম। ইদানীং প্রায় দেখতাম সন্ধ্যার পর গোলোক মন্দির চত্বরে গিয়ে বসে থাকত। জিজ্ঞেস করলে বলত, মনে সুখ নেই বড়োবাবু দেবতার কাছে শান্তি খুঁজছি।

গোলোক বলত?

-বলত বলেই মন্দিরে খুঁজতে গিয়েছিলাম। যেই গোলোক বলে ডেকেছি, অমনি কেন যেন চমকে উঠল। মন্দির চত্বরের ওপর বাড়ির দোতলার ঘরের আলো পড়ে। সব স্পষ্ট দেখা যায়। ওকে চমকে উঠতে দেখে বললাম, কী হয়েছে রে? সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বুক চেপে ধরে পড়ে গেল। তারপর কাটা পাঁঠার মতো ধড়ফড় করতে করতে স্থির হয়ে গেল।

ডাক্তার এসে কী বললেন?

–হার্টফেল।

-রণজয়বাবু! সত্যিই কি ডাক্তার এসে বললেন হার্টফেল? আমার ধারণা, ডাক্তার বলেছিলেন, আত্মহত্যা করেছে গোলোক। পুলিশের ঝামেলার ভয়ে আপনি ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন হার্টফেলের উল্লেখ করে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে।

রণজয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন- হ্যাঁ। গোলোক সায়ানায়েড জাতীয় কিছু খেয়েছিল। কোনও কারণে ইদানীং ওর চালচলনে কেমন যেন অস্থিরতা লক্ষ্য করতাম। গত বছর ওর বউ মারা যায়। ছেলেপুলে ছিল না। কাজেই মানসিক অশান্তিই ওর আত্মহত্যার কারণ।

-রণজয়বাবু! আপনারা তো দু'ভাই?

–আমি আর সঞ্জয়ের বাবা ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় ক্যানসারে মারা যায়।

–আপনার কাছে আপনার শ্যালক থাকেন বলছিলেন। কী যেন নাম?

–চণ্ডী।

–চণ্ডীবাবু আছেন?

রণজয়বাবু বাঁকা মুখে বললেন, –চণ্ডী কখন আছে, কখন নেই বলা কঠিন। বাউন্ডুলে স্বভাব। সামান্য যা জমিজমা আছে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু খায়দায় আর টো-টো করে ঘোরে। বয়সের তো লেখাজোখা নেই। অথচ নাবালক থেকে গেল এখনও। ধর্মের ষাঁড় আর কী!

কর্নেল পা বাড়িয়ে একটু হেসে বললেন, -চলুন তাহলে। ধর্মের ষাঁড়টিকে দেখে আসি।

-ওকে পাচ্ছেন কোথায়?

–মন্দিরেই পাব। শিবের বাহন শিবমন্দিরেই থাকা উচিত।

–মন্দিরে তো ওকে ...

–চলুন তো!

যে বিশাল মন্দিরটার পাশ দিয়ে এসেছি, এবার রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সেখানে ঢুকলাম। চত্বরে গিয়ে কর্নেল বললেন- গোলোক কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল?

উঁচু মন্দিরের সিঁড়ির নীচেটা দেখিয়ে দিলেন রণজয়বাবু, –এই সিঁড়ির ধাপেই বসে থাকত গোলোক।

কর্নেল সিঁড়ির শেষ ধাপে খোলা একটুকরো বারান্দার দিকে আঙুল তুলে বললেন, –ওই তো ধর্মের ষাঁড়। শিবের বাহন।

কথাটা বলেই সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গেলেন। তারপর সেই ধাঁধাটা আওড়ালেন :

পাষণ্ডের পা

কভু ধরিস না

মস্তকে ঘা।

কী জ্বলে রে বাবা।

রণজয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, -কী ব্যাপার কর্নেলসায়েব?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, -ষাঁড়ের মাথা কে ভাঙল রণজয়বাবু?

রণজয়বাবু উঠে গেলেন, –সে কী। মাথাটা ভাঙা লক্ষ্য করিনি তো!

কর্নেল বললেন, -ধাঁধার জট ছাড়াতে বলেছিলেন। ছাড়িয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হল না।

রণজয়বাবু চমকে উঠে বললেন, -লাভ হল না?

না। -কর্নেল মাথা নাড়লেন : পাষণ্ডের পা কভু ধরিস না। এর মানে হচ্ছে, পাষণ্ড শব্দের পা ধরা হবে না। পা না ধরলে বাকি রইল ষণ্ড। অর্থাৎ কি না ষাঁড়। এবার মস্তকে ঘা। তার মানে, ষাঁড়ের মাথায় ঘা মারতে হবে। ঘা মারলে মাথা ভেঙে যাবে। তারপর বলা হয়েছে, কী জ্বলে রে বাবা! এই জ্বলে শব্দে বোঝায় জ্বলজ্বল করছে। উজ্জ্বলতা। কীসের এই উজ্জ্বলতা? হিরের! মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার জন্য আপনাদের পূর্বপুরুষকে বাদশাহ আকবর যে হিরে উপহার দিয়েছিলেন, সেই হিরে। জন্মেজয় সিংহ বংশধরদের জন্য এই হিরেটা এই ষাঁড়ের মাথার ভেতরে লুকিয়ে রেখে ধাঁধা তৈরি করেছিলেন। ধুম্রগড়ের রাজকাহিনি বইয়ে। বাদশাহের দেওয়া হিরের কথা আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তা ধাঁধায় বলা হয়েছে।

রণজয়বাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন-কে ষাঁড়ের মাথা ভাঙল?

–গোলোক ভেঙেছিল।

–কিন্তু হিরে কোথায় গেল?

–গোলোকের পেটে।

–কী সর্বনাশ!

–হ্যাঁ, সর্বনাশ!

-হ্যাঁ, সর্বনাশ তো বটেই। হিরে সাংঘাতিক বিষ। আপনাকে আসতে দেখে হিরের টুকরোটা গোলোক গিলে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়ায় ওর মৃত্যু হয়।

–কিন্তু গিলল কেন হতভাগা? লুকিয়ে ফেলতে পারত জামা কাপড়ের তলায়।

–বোকা গোলোক কারও হুকুম পালন করেছিল টাকার লোভে। ওকে বলা হয়েছিল, ধরা পড়ার উপক্রম হলে যেন সে ওটা গিলে ফেলে। গোলোক জানত না হিরে মারাত্মক বিষ।

রণজয়বাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল বললেন- আপাতত এই পর্যন্ত। তবে আশাকরি, আপনাদের বংশের ঐতিহাসিক হিরে উদ্ধার করে দিতে পারব। ...

.

**পিশাচ দর্শন|** রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললাম-তা হলে কলকাতায় বসে ঠিকই রহস্যের জট ছাড়াতে পেরেছিলেন। কিন্তু পিশাচ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

বোঝা যাবে। আগে সেই রামবাবু ফোটোগ্রাফারের দোকানে যেতে হবে।

– বলে কর্নেল রাস্তায় একটা সাইকেল-রিকশা ডাকলেন।

বাজার এলাকায় গিয়ে রামবাবুর দোকানের খোঁজ পাওয়া গেল। দোকানের নাম জয় মা কালী স্টুডিয়ো। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজিতে লেখা সাইনবোর্ড। কর্নেলকে দেখেই বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন, –কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! কর্নেলসায়েব যে! আসুন। পায়ের ধুলে দিন। এবার কতগুলো প্রজাপতি আর অর্কিডের ছবি তুললেন? গত মাসে তো অনেক তুলেছিলেন।

বুঝলাম রামবাবুর স্টুডিয়োতে কর্নেল ছবি প্রিন্ট করিয়েছিলেন। কর্নেল ভেতরে ঢুকে বললেন, ছবি এখনও তুলিনি। তুলব। তবে আগে পিশাচ দর্শন করতে চাই। আপনি নাকি পিশাচের ছবি তুলেছেন।

রামবাবুর মুখে ভয়ের ছবি ফুটে উঠল। চাপা স্বরে বললেন, -ভয়ের ঘটনা কর্নেলসায়েব! তবে আমার পেশার লোকদের এই একটা অভ্যাস আছে। আসলে ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করা ছিল। ফ্ল্যাশ ফিট করা ছিল না।

– তাহলে পিশাচ যেন আপনার কাছে ছবি ওঠাতেই এসেছিল।

রামবাবু হেসে ফেললেন, – তা যা বলেছেন স্যার। ফ্ল্যাশ ফিট করে ছবি তুললাম। তখন জানালার ধার থেকে থপথপ করে চলে গেল। বাগানে ঢুকে পড়ল।

পিশাচটা পাবলিসিটি চাইছে আর কী!–কর্নেল হাসলেন : যাই হোক, কই দেখি পিশাচের ছবি।

রামবাবু ড্রয়ার টেনে বললেন, পুলিশ এসে নেগেটিভটা সিজ করেছে। মোট তিরিশখানা প্রিন্ট বেচেছি। দু-খানা প্রিন্ট পুলিশ নিয়েছে। একখানা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই থেকে নেগেটিভ করব। মনে হচ্ছে প্রচুর বিক্রি হবে।

রঙিন ছবিটা দেখে শিউরে উঠলাম। জানলার গরাদের বাইরে একখানা ভয়ংকর মুখ উঁকি মেরে আছে। দুখান সুচালো কষধাঁত বেরিয়ে আছে। লাল ঠোঁটে চাপচাপ রক্ত। গোরিলা নয়। কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, ক্রোম্যাগননের পরবর্তী কোনও পর্যায়ের নরবানর। বীভৎস ছবি।

কর্নেল আতশ কাচে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, -রেখে দিন।

রামবাবু চাপা স্বরে বললেন, -কদিন আছেন তো? একটা কপি আপনার জন্য রাখব।

রাখতে পারেন। -বলে কর্নেল বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় গিয়ে বললাম, -হালদারমশায়ের জন্য ভয় হচ্ছে। ওঁকে খুঁজে বের করা উচিত কর্নেল!

কর্নেল বললেন, –চলো! এবার শ্মশানতলায় যাওয়া যাক। একটু দূর হবে। রিকশ ডাকি।

কিন্তু কোনো রিকশই শ্মশানতলায় যেতে রাজি হল না। শুধু একজন বলল, সে রাস্তার মোড় অব্দি যাবে। দশ টাকা লাগবে। কর্নেল রাজি হলেন।

রাজবাড়ি এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তার মোড় এল। রিকশওয়ালা বলল, -ইধার সিধা চলা যাইয়ে।

এবড়োখেবড়ো খোয়াঢাকা রাস্তার দুধারে জঙ্গল আর টিলা। কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছিলেন। আমার ভয় হচ্ছিল, বিরল প্রজাতির কোনও পাখির পিছনে উধাও হয়ে না যান।

গেলে পরে আমাকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই পিশাচটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার নাড়িভুড়ি খেয়ে ফেলতে দেরি করবে না।

কর্নেল উধাও হলেন না। কিছুক্ষণ পরে আমরা শ্মশানে পৌঁছোলাম। চারদিকে ডালপালা ছড়ানো ঝুরি নামানো আদ্যিকালের বটগাছ। তারওধারে শরৎকালের ভরা নদী। এখানে-ওখানে। চিতার ছাই আর ভাঙা মাটির কলসি পড়ে আছে। একপাশে কয়েকটা পাথরের ঘর মুখ থুবড়ে। পড়েছে। তার কাছে একটা পাথরের মন্দির। কতকটা বৌদ্ধস্তূপের গড়ন। খানিকটা ফোকর দেখা যাচ্ছে স্তুপে। ওটাই সম্ভবত দরজা ছিল। মাটিতে বসে গেছে। ঝোপেও ঢাকা পড়েছে। বললাম, কর্নেল! পিশাচটা ওই স্তুপের ভেতর থাকে না তো?

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে বটতলায় একটা ঝুরির কাছে গেলেন। তারপর বললেন এখানে কোনও সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়েছিল দেখছি। ছাইটা টাটকা। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়নি, মাটি দেখে বোঝা যাচ্ছে। একটা ছোট্ট ত্রিশূল আর-মড়ার খুলি!

কর্নেল খুলিটা কুড়িয়ে নিয়েই ফেলে দিলেন। ঠকাস করে শব্দ হল। হাসতে হাসতে বললেন, প্লাস্টিকে তৈরি নকল খুলি। কাজেই হালদারমশাই ছদ্মবেশী সাধু সেজে এখানে ধুনি জ্বেলেছিলেন, এতে আমি নিঃসন্দেহ।

বললাম, -উনি গেলেন কোথায়?

কর্নেল মাটিতে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে থমকে দাঁড়ালেন। কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, -একটুকরো জটা! মেড ইন চিতপুর। পাটের তৈরি জটা! জয়ন্ত, হালদারমশাইয়ের নকল জটা ছিঁড়ে পড়ার একটাই অর্থ হয়। ওঁকে কেউ আক্রমণ করেছিল।

– সর্বনাশ! তাহলে পিশাচের পাল্লায় পড়েছিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক। কিন্তু ওঁর কাছে তো রিভলভার থাকে।

কর্নেল স্তূপটার কাছে এগিয়ে গেলেন। পিঠের কিটব্যাগ থেকে টর্চ বের করে সেই ফোকরের কাছে গুঁড়ি মেরে বসলেন। টর্চ জ্বেলে ভেতরটা দেখেই বলে উঠলেন, –জয়ন্ত। দেখে যাও!

দৌড়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, খটখটে পাথুরে মেঝেয় চামচিকের নাদির ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন আমাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভ। হাত এবং পা বাঁধা। মুখে টেপ সাঁটা ছিল। খুলে গেছে। তার চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার, টর্চের আলোয় চামচিকের ঝক ছত্রভঙ্গ হয়ে ওড়াউড়ি করছে। হালদারমশাইয়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। কিন্তু ওঁর সাড়া নেই। অজ্ঞান হয়ে আছেন নাকি?

কর্নেল ডাকলেন- হালদারমশাই! হালদারমশাই!

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পিটপিট করে তাকালেন। বললেন, -জ্বালাতন! তোরা আমারে মারস। ক্যান! যা! যা! আবার মারে! চামচিক্যা কি আর সাধে কয়?

– হালদারমশাই! হালদারমশাই!

অ্যাঁ? হালদারমশাই মাথা ঘোরালেন : হালার পিচাশ? আবার আইছ? একখান দাঁত উড়া ফ্যালাইছি। আরেক খান রাখুম না! কাম অন!

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! এই ছুরি নিয়ে ভেতরে ঢোকো। বাঁধন খুলে ওঁকে বের করে আনন। আমার এই প্রকাণ্ড শরীর ভেতরে ঢোকানো যাবে না।

আঁতকে উঠে বললাম, -বড় চামচিকে যে!

-দেরি কোরো না। চামচিকের চাঁটিতে মাথা খুলে যাবে। ঢোকো।

চোখ বুজে ঢুকে পড়লাম। চামচিকের ঝাঁকের চাটির পর চাটি খেতে খেতে বাঁধন কেটে গোয়েন্দাকে টেনে বের করলাম। তখনও উনি গর্জাচ্ছেন! শাসাচ্ছেন পিচাশের বাকি দাঁতটাকে উপড়ে দেবেন বলে। আধখানা নকলদাড়ি মুখের পাশে ঝুলছে। জটার খানিকটা আটকে আছে। পরনে লাল খাটো লুঙি।

গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে ঝুলছে। গোঁফের কোনায় সেলোটেপও ঝুলছে। বাইরে বেরিয়ে ওঁর হুঁশ হল। চোখ মুছে বললেন, -হালার পিচাশটা গেল কই?

কর্নেল বললেন, -নদীর জলে মুখ-কাঁধ রগড়ে ধুয়ে নিন হালদারমশাই!

হালদারমশাই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর খিকখিক করে হেসে বললেন, কর্নেলস্যার! জয়ন্তবাবু! আপনারা আইয়া পড়ছেন? পিচাশটারে আমি জব্দ করছি! একখান দাঁত

– নদীতে চলুন হালদারমশাই! গোঁফের পাশে টেপ ঝুলছে। জল না দিলে আটকে থাকবে।

কর্নেল ওঁকে টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন!....

**হিরের খোঁজে|** হালদারমশাইয়ের মুখে জানা গেল, কলকাতা থেকে এসে তিনি নিউ ধূমগড়ে একটা হোটেলে উঠেছিলেন। তারপর কাল রাত নটায় শ্মশানতলায় এসে ধুনি জ্বেলে সাধু সেজে বসেন। শেষ রাতে, ঘুমের দুলুনি চেপেছিল। হঠাৎ পেছনে থেকে পিচাশের গায়ে জোর বলেও নয়, বেকায়দায় পড়ে হালদারমশাই বন্দি হন। তাকে টানতে টানতে স্যুপের ভেতর ঢোকায় হালার পিচাশ। মুখে টেপ সেঁটে দিয়েছে। চাঁচানোরও জো ছিল না।

কর্নেল বললেন, -জয়ন্ত! এই অবস্থায় হালদারমশাই হোটেলে ফিরতে গেলে পাগল ভেবে লোক জমে যাবে। এখান থেকে সোজা নাকবরাবর হেঁটে গেলে ফরেস্টবাংলো দেখতে পাবে। ওঁকে নিয়ে গিয়ে তোমার একপ্রস্ত পোশাক পরতে দাও। ওঁর কিছু খাওয়াদাওয়াও দরকার। দেরি কোরো না। আমি অন্যদিকে যাচ্ছি।

হালদারমশাই হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, –আমার রিভলবার গেল কই? আসনের তলায় রাখছিলাম।

মেড ইন চিতপুর নকল বাঘছালের আসনটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কর্নেল বললেন, –পিশাচ আপনার রিভলভারের লোভ ছাড়তে পারেনি।

হালদারমশাই চিন্তিতমুখে বললেন- ফায়ার আর্মস পিচাশের কোন্ কামে লাগব?

কর্নেল আর কোনও কথা না বলে চলে গেলেন। এর পর হালদারমশাইকে নিয়ে আমি কীভাবে যে বাংলোয় পৌঁছুলাম কহতব্য নয়। সারা পথ বুক ঢিপঢিপ করছিল। এই বুঝি পিশাচটা ঝোপের আড়াল থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চৌকিদার দয়ারাম হাঁ করে তাকিয়ে গোয়েন্দা ভদ্রলোককে দেখছিল। বললাম, –শিগগির ওঁকে কিছু খাইয়ে দাও, দয়ারাম। হালদারমশাই আপনি বরং স্নান করে নিন। ওই দেখুন কুয়ো আছে!

দয়ারামের কাছে জানা গেল, কুয়োটা আসলে এই টিলার মাথায় একটা প্রস্রবণ। ওটা ছিল বলেই বনদফতর এখানে বাংলো তৈরি করেছিল।

স্নান করে আমার পাঞ্জাবি-পাজামা পরে হালদারমশাই শুধু দুখানা টোস্ট আর এক কাপ কফি খেলেন। তারপর আমার বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকলেন।

কর্নেল এলেন বেলা দুটো নাগাদ। হালদারমশাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন, –আপনার রিভলভারটা উদ্ধার করেছি। এই নিন। উনি কিটব্যাগ থেকে রিভলভার বার করে দিলেন।

অবাক হয়ে বললাম, -কোথায় পেলেন ওটা?

-পিশাচের ডেরায়। সিন্থেটিক বাঘছালে মোড়া ছিল। বাঘছালটা একই অবস্থায় রেখেছি।

-জায়গাটা আপনি খুঁজে বের করেছেন?

-হ্যাঁ। পশুপাশি কীটপতঙ্গ সব প্রাণীরই ডেরা থাকে। কাজেই পিশাচেরও একটা ডেরা থাকা উচিত। যাইহোক, এখন আর কোনও কথা নয়। হিরে উদ্ধার বাকি আছে। লাঞ্চ খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরুব।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা বেরোলাম বাংলো থেকে! কর্নেল বললেন- হালদারমশাই! একটা কথা। দৈবাৎ যদি আমরা পিশাচটাকে জঙ্গলে দেখতে পাই, সাবধান! যেন গুলি ছুঁড়বেন না। তবে রিভলভার বের করে ওকে ভয় দেখাতে পারেন। কিন্তু কক্ষনো গুলি ছুঁড়ে বসবেন না। পিচাশটাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় ধরতে চাই।

অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কর্নেল বনবাদাড় ভেঙে হাঁটছিলেন। মাঝে মাঝে পাথরে উঠে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন।

বললাম, -কর্নেল! আপনি কি পিচাশের ডেরায় যাচ্ছেন?

কর্নেল বললেন, -নাহ, শ্মশানতলায়।

-শ্মশানতলায় কেন?

কর্নেল হাসলেন, –আপত্তি আছে তোমার? আমাদের সবাইকে তো একদিন শ্মশানে যেতেই হবে। কী বলেন হালদারমশাই?

হালদারমশাই গম্ভীরমুখে বললেন, -হঃ!

বললাম, জায়গাটা অস্বস্তিকর। মড়াপোড়ানো ছাইয়ের গাদা। বিশেষ করে চিতার ছাই দেখলেই আমার গা ছমছম করে।

কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন, –কী বললে? চিতার ছাই?

– হ্যাঁ। কিন্তু এতে চমকে ওঠার কী আছে?

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। হালদারমশাই লম্বা পা ফেলে ওঁকে অনুসরণ করলেন। পিছিয়ে পড়ার ভয়ে আমিও প্রায় জগিং শুরু করলাম।

শ্মশানতলায় পৌঁছে কর্নেল বললেন, -হালদারমশাই, দেখুন তো! এলোমেলো অনেক চিতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে টাটকা চিতা কোটা হতে পারে? যতদূর জানি, বৃহস্পতিবার রাতে গোলোকের

মড়া পোড়ানোর পর পিশাচের ভয়ে এ শ্মশানে আর কোনও মড়া পোড়ানো হয়নি। নিউ ধূমগড়ের নতুন শ্মশানে সবাই মড়া পোড়াচ্ছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক ঘোরাঘুরি করে দেখতে দেখতে বললেন, -বৃষ্টিবাদলায় সবগুলি হেভি ধুইয়া গেছে। তবে আপনি কার চিতা কইলেন য্যান?

–রাজবাড়ির স্যারভ্যান্ট গোলোকের। মানে যার মড়ার নাড়িভুড়ি খেয়ে ফেলেছিল পিশাচ।

–তবে তো ওনার চিতার ছাই হেভি হইব। বলে হালদারমশাই লাফ দিয়ে এগোলেন।

-লাস্ট বার্নিং কর্নেল স্যার! হেভি অ্যাশ! এই যে।

কর্নেল গিয়ে বৃষ্টির জল থিকথিকে পাঁকের মতো ছাইগুলো ঘাটতে শুরু কলেন। বললাম, -ও কী করছেন?

কর্নেল আওড়ালেন, –যেখানে দেখিবে ছাই/উড়াইয়া দেখ তাই পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

হালদারমশাইও হাত লাগাতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাকে নিষেধ করলেন! একটু পরে ছাইগাদার তলা থেকে কী একটা জিনিস কুড়িয়ে কর্নেল নদীর ধারে দৌড়ে গেলেন। জলে সেটা ধুয়ে পকেটে ঢুকিয়ে হাসলেন, –জয়ন্ত! শ্মশানতলায় আসছিলাম পিশাচটার জন্য ওত পাততে। কারণটা পরে বলছি। তবে এবারও তুমি রহস্যের দ্বিতীয় পর্ব ফাঁস করেছ! ধন্যবাদ ডার্লিং! অসংখ্য ধন্যবাদ! হিরে উদ্ধার হয়ে গেল।

–বলেন কী! ওই জিনিসটা হিরে? গোলোকের চিতার ছাইয়ে কে লুকিয়ে রেখেছিল?

–কেউ না। হিরেটা গিলে গোলোক মারা পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাকস্থলীতে হিরে পৌঁছোনোর কথা নয়। গলার নলিতেই আটকে যাওয়া উচিত। কারণ হিরে খাঁজকাটা ধাতু।

হালদারমশাই বললেন, কই দেখি!

– পরে দেখাব। এবার পিশাচের জন্য ওত পাততে হবে। বটগাছের আড়ালে চলুন।

বটগাছের ঝুরির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গুঁড়ির আড়ালে তিনজনে বসে পড়লাম। সামনে ঝোপজঙ্গলে ঢাকা ঢালু মাটি নদীতে নেমেছে। এখানে-ওখানে বড়ো বড়ো পাথর পড়ে আছে। হঠাৎ দমকা বাতাসে উৎকট গন্ধ ভেসে এল। নাক ঢাকলাম। চাপা স্বরে বললাম, -এ কিসের দুর্গন্ধ?

কর্নেল ইশারায় চুপ করতে বললেন। বেলা পড়ে এসেছে। পাখিরা তুমুল হল্লা জুড়েছে। সামনে একটা পাথরের আড়ালে একটা শেয়াল এসে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রায় জান্তব গলায় কার গর্জন শোনা গেল, –যাঁ! যাঁঃ! যাঁঃ!

হালদারমশাই উত্তেজনায় ফিশফিশ করে বললেন, পিচাশ! পিচাশ!

এবার পিশাচের শরীরের খানিকটা দেখতে পেলাম। কালো লোমশ শরীর। মুখ এদিকে ঘোরাতেই শিউরে উঠলাম। একটা কষদাঁত সুচোলো হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্যটা হালদারমশাই ভেঙে দিয়েছেন বলছিলেন। ভাটার মতো চোখ। ভয়ঙ্কর মুখ। পাথরটার পাশে সে বসে পড়ল। তারপর বুঝলাম, সে খন্তাজাতীয় কিছু দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। দুর্গন্ধটা বাড়ছে।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, –তিনজন তিনদিক থেকে ঘিরে ফ্যালো।

আগে হালদারমশাই, তারপরে কর্নেল, শেষে আমি গিয়ে পিশাচটাকে ঘিরে ধরলাম। কর্নেল এবং হালদারমশাইয়ের হাতে রিভলভার। পিশাচটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখলাম, সে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

পিশাচটা গর্জন করতেই কর্নেল বললেন, –এক পা নড়লেই খুলি ফুটো হয়ে যাবে।

পিশাচটা নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগেই হালদারমশাই এক লাফে তার সামনে গেলেন, -হালার পিচাশ! ঘুঘু দ্যাখছ, ফান্ দ্যাখো নাই!

কর্নেল গিয়ে পিশাচের মুখে চাটি মারার মতো বাঁ-হাত চালালেন এবং হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ যে দেখছি পিশাচের মুখোশপরা একটা লোক।

কর্নেল বললেন, -চণ্ডীবাবু! গোলোকের পাকস্থলীতে খাঁজকাটা হিরে পৌঁছোনোর কথা নয়। কাজেই ওর নাড়িভুড়ি কেটে তুলে এনে এখানে পুঁতে রোজ একবার করে তা কাটাকুটি করে হিরে হাতড়ানোর মানে হয় না। খামোখা রোজ ওই পচা দুর্গন্ধ জিনিসগুলো ঘাঁটা পণ্ডশ্রম।

হালদারমশাই একটানে কালো লোমশ আবরণ খুলে রণজয়বাবুর শ্যালক চণ্ডীবাবুকে বের করলেন। চকাস করে একটা ছুরিও পড়ল। হালদারমশাই বললেন, –চিতপুরে কিনছিল। তবে ছুরিখানা রিয়্যাল ছুরি। শৃগালটা গেল কই? পচা নাড়িভুঁড়িগুলো শৃগালের প্রাপ্য।

কর্নেল চণ্ডীবাবুর জামার কলার খামচে ধরে বললেন, -চলুন চণ্ডীবাবু! এবার অন্য শ্বশুররালয়ে আপনার থাকার ব্যবস্থা হবে।

চণ্ডীবাবু হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, -মাইরি, মা কালীর দিব্যি স্যার! আমি হিরে চুরি করিনি।

– না, না। হিরে নিজের হাতে চুরি করেননি। ষাঁড়ের মাথা ভাঙার ঝুঁকি নিতে চাননি। গোলোকের হাত দিয়ে কাজটা সারতে চেয়েছিলেন। আপনি ধুরন্ধর চণ্ডীবাবু! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করা উচিত। জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়িয়েছিলেন আপনি। তারপর অনবদ্য আপনার পরিকল্পনা। গোলোক হাতেনাতে ধরা পড়লে পাছে আপনার কারচুপি ফাঁস করে দেয়, তাই আপনি ওকে হিরেটা গিলে ফেলতে বলেছিলেন। তারপর পিশাচ সেজে শ্মশানে ভয় দেখিয়ে লোকগুলোকে তাড়িয়ে গোলোকের নাড়িভুড়ি কেটে এনে এখানে পুঁতেছিলেন। পিশাচ যে সত্যিই গোলোকের নাড়িভুড়ি খেয়েছে এবং বিশেষ করে সত্যিই এখানে পিশাচের আবির্ভাব ঘটেছে, তা এস্টাব্লিশ করার জন্য শুধু রণজয়বাবুর জানালায় নয়, ফোটোগ্রাফার রামবাবুর জানলাতেও হাজির হয়েছিলেন। আপনি জানতেন, রামবাবু ফোটো না তুলে ছাড়বেন না। তাই অতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতে আপনার পাবলিসিটি হবে। তবে রামবাবুর কাছে আপনার পিশাচমূর্তির ফোটো আতশকাচে খুঁটিয়ে দেখেই বুঝেছিলাম, এটা মুখোশ মাত্র। তারপর এখানে এসে দুর্গন্ধ টের পেয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে কর্নেল আসামিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার একটা পুলিশের জিপ আসতে দেখা গেল এবড়োখেবড়ো রাস্তায়। জিপ এসে থামল। একদল পুলিশ বেরিয়ে পড়ল। একজন অফিসার সহাস্যে বললেন তাহলে আমরা আসার আগেই পিশাচ ধরে ফেললেন কর্নেলসায়েব! শেষ দৃশ্য দেখার সুযোগ দিলেন না।

কর্নেল আসামিকে কনস্টেবলদের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন, -বেলা থাকতে থাকতে পিশাচ এসে মাটি খুঁড়বে জানতাম না। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যা না হলে আসবে না। কিন্তু ওর তর সইছিল না। আপনারা থানায় চলুন। আমরা রাজবাড়ি হয়ে থানায় যাব।

পুলিশের গাড়ি চলে গেল।

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কর্নেলস্যার! হালপিচাশের ডেরা- হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস?

কর্নেল হাসলেন, -রাজবাড়িতেই রাজবাড়ির শ্যালকের ডেরা থাকা কি স্বাভাবিক নয়? রণজয়বাবুর কাছে ওঁর শ্যালকের ঘরের চাবি ছিল না। আমার কাছে সবসময় মাস্টার-কি থাকে। তাই দিয়ে খুলোম। আপনার বাঘছালে মোড়া রিভলভার পেলাম। কয়েকটা চিঠি পেলাম। কলকাতার এক জুয়েলার কোম্পানি হিরে কিনতে চেয়েছিল। তাদের গতকাল এখানে পৌঁছুনোর কথা। নিউ ধূমগড়ে হোটেল প্যারাডাইসে তারা অপেক্ষা করবে। দুপুরে সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলাম। তাদের সঙ্গে চণ্ডীবাবু লাঞ্চ খাচ্ছিল ডাইনিং হলে। সেখান থেকে ভাগ্যিস বাড়ি ফেরেনি। তাহলে ঘরে ঢুকে সব টের পেয়ে সাবধান হয়ে যেত। যাক গে। রণজয়বাবু অপেক্ষা করছেন। হিরেটা তার হাতে পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন, -হিরেখানা একবার দ্যাখাইবেন না কর্নেলস্যার?

কর্নেল কপট গাম্ভীর্যে বললেন, -চোখ জ্বলে যাবে। ধুম্রগড়ের রাজকাহিনির ধাঁধায় বলা আছে :

পাষণ্ডের পা

কভু ধরিস না।

মস্তকে ঘা

কী জ্বলে রে বাবা

হালদারমশাই আনমনে বললেন, -হঃ! বুঝছি।

কী বুঝলেন তা অবশ্য বললেন না...

**সমাপ্ত**